বাংলাদেশের নাটক

নৃপেন্দ্র নাথ সরকার

বাংলাদেশের নাটকের মূল্যায়ন করতে জীবনানন্দ দাশের বাণী নকল করা ছাড়া আর কোন পথ দেখছি না, “বাংলাদেশের নাটক আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর নাটক দেখিতে যাই না আর।”

নাটকে নোবেল প্রাইজ থাকলে, বাংলাদেশ অবশ্যই এতদিনে পেয়ে যেত। বাংলাদেশের নাটকে অগ্রগতি ও উৎকর্ষ অভাবনীয়, তুলনাহীন। এক বুক দম নিয়ে আমি এই দাবী করি। নিন্দুক বলতেই পারে, বাংলাদেশের নাটকের প্রতি আমার অন্ধত্ব (Obsession) বা পৃথিবীর নাটক সমন্ধে আমার অজ্ঞতার কারনেই আমি এত বড় কথা বলছি। তাতে আমার কী আসে যায়! আমার বিশ্বাস, আমার দৃঢ়তায় আমি অটল, অনমনীয়। নাটক আমার পড়াশুনা বা গবেষনার বিষয় নয়। আমি নাটকের নিয়মিত দর্শক। নাটক নিয়ে আমি যদি বেশী বলি, সেটা আমার ভাল লাগার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বাংলাদেশে নাটকে যে বিপ্লব এসেছে তার এক-দশমাংশও যদি দেশটির শিক্ষা, আর্থিক, শিল্পায়ন, নগরায়ন, যোগাযোগ ইত্যাদিতে হত তাহলে দেশটি জাপান, দক্ষিন কোরিয়া বা তাইওয়ানের কাছে চলে আসত।

নাটকের ভাল মন্দ

ভাল নাটকের কোন গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। দর্শক ভাল বললে ভাল, খারাপ বললে খারাপ। সিনেমা দর্শকের মত নাটকের দর্শকও আবার নানা কিসিমের। অনেকের সত্যজিত রায়ের ছবি ভাল না লেগে ভাল লাগে ‘বাবা কেন চাকর’ জাতীয় চিরাচরিত সস্তা ছবি। তবে বিজ্ঞজনেরা সাহিত্যকে সমাজের দর্পন হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। নাটকও সাহিত্যের অংগ। সেই হিসেবে, যে নাটক দিয়ে সমাজকে যত স্বচ্ছ দেখা যাবে তাকেই তত ভাল বলা যেতে পারে। স্বচ্ছ শব্দটার উপর একটু জোড় দেওয়া দরকার। অর্থাৎ দর্পনের কাঁচটি সমতল হওয়া দরকার। অবতল বা উত্তল হলে প্রতিবিম্বটি সঠিক না হয়ে হয় বিকৃত। বিকৃত জিনিষের মূল্য কখনোই থাকে না, এক ঝলক হালকা হাসির উদ্রেক করে মাত্র।

নাটকের ঘটনায় বাহুল্য বা চমক বা রহস্য থাকলেও তাই হয়। শুড়শুড়ি, কাতুকুতো বা গুতোগুতি দিয়ে সহজেই তা ক্ষনিক ভাবে হাসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই সব শুড়শুড়ি, কাতুকুতো বা গুতোগুতি কখনোই মনে দাগ কাটে না। মূল্য কখনই স্থায়ী হয় না।

দক্ষিন কোরিয়ার দুটো ধারাবাহিক দেখেছি শুধুমাত্র সাবটাইটেল পড়ে পড়ে। নাটকের উৎকর্ষ হল নিজ সংস্কৃতি, ভাষা, সামাজিক অবস্থান, রীতিনীতি, ইত্যাদির উপর। বিদেশী নাটক অনুসরণ একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার তো বটেই। তবুও দেখেছি কারন ভাল লেগেছে। ওদের নাটকের মান ভাল। একশতে আশি দেওয়া যায়। কিন্তু ইটিভি, জিটিভি বা সনি টিভির কোন নাটককে শূন্যের বেশী দেওয়া রীতিমত অন্যায়।

এক পর্ব নাটক

বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) টেলিভিশনের সূচনালগ্নে, সম্ভবত ১৯৬৭ সনে, রবিঠাকুরের ডাকঘর নাটক দেখি। স্বল্প কিছু সংলাপ নিয়ে পিশেমশাইর চরিত্রে ছিলেন জনাব আবুল হায়াত। প্রথম দেখেই চিনে ফেলি এই শক্তিশালী অভিনেতাকে। তাঁর সাথে অমলের চরিত্রে তখন যে ছেলেটি অভিনয় করেছিল তাকেও মনে ধরে। নিশ্চয়ই সেদিনের 'সে' এখন একজন নামকরা 'তিনি' হয়েছেন। জানতে ইচ্ছে করে, 'তিনি'টি এখন কে? ডাকঘর নাটক আরো অনেকে করেছে, কিন্তু সেই আবুল হায়াত আর অমলের মত আর কেউ করতে পারেনি। এখনও অসুস্থ অমলকে স্পস্ট দেখতে পাই। সুস্থ হয়েই পাহাড়ে ঝর্ণার ধারে যাবে, ছাতু খাবে।

আমি একজন নিয়মিত নাটক দর্শক। মহিলা সমিতি মঞ্চে নাটক না দেখে কম সময়ই ময়মনসিংহ ফিরেছি। ভাল নাটক দীর্ঘদিন মনে থাকে। সত্তর দশকের শেষার্দ্ধে শঙ্খনীল কারাগার দেখি টেলিভিশনের পর্দায়। আমার দেখা হুমায়ূন আহমেদের প্রথম নাটক। হুমায়ূন আহমেদ আমার কাছে তখন অচেনা নাম। মাত্র দু-একটা সংলাপের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারি, এঁর নাটক দেখতেই হবে। বড়ভাই বুলবুল আহমেদ একমাত্র বোনকে নিয়ে মহা বিপাকে। এই দুঃসময়ে গোটা পরিবার তাকিয়ে আছে তার উপর। অথচ এই জটিল ও করুন সমস্যাটি সমাধানের কোন আলাদিনের চেরাগ বুলবুলের হাতে নেই। চারিদিকে নিষ্ঠুর নিস্তব্দ্বতা। বুলবুলের বুক ভেংগে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না। সমাধান খুঁজছে। অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য বুলবুলের কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু কী বলবে সে!

> বুলবুল – এটা কী মাস?
> আসাদুজ্জামান – সেপ্টেম্বর।
> বুলবুল – বাংলায়!
> আসাদুজ্জামান – চৈত্র।

অসহনীয় যন্ত্রনার গভীরতা প্রকাশের জন্য হুমায়ুন আহমেদকেই প্রথম দেখেছি একটি অপ্রাসংগিক সংলাপ সংযোজন করতে। অসহনীয় যন্ত্রনার প্রকাশ গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে সেপ্টেম্বরকে চৈত্রের সাথে গুলিয়ে ফেলে দিয়ে। হুমায়ূন আহমেদের কলমের ক্ষমতার তারিফ না করে পারিনা।

ধারাবাহিক নাটক – হুমায়ূন আহমেদ

শুকতারাই বোধ হয় বাংলাদেশের প্রথম ধারাবাহিক এবং প্রথম মহিলা নাট্যকারের নাটক। নাট্যকারের নামটি মনে করতে পারছিনা বলে নিজেকে খুবই অপরাধী বোধ করছি। আফরোজা বানু ও পীযুষ বন্দোপাধ্যায় প্রধান চরিত্রে ছিলেন। শ্যালিকার ভূমিকার মেয়েটিও অত্যন্ত ভাল অভিনয় করেছিল। প্রথম নামটি মনে আসি আসি করেও আসছে না।শেষ নাম বরকতুল্লাহ। নাট্যামোদী দর্শক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত ধারাবাহিকটির জন্য এবং প্রার্থনা করত নাটক চলাকালীন যেন লোডশেডিং বা বিদ্যু্ বিভ্রাট না হয়।

শুকতারার পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনে হুমায়ূন আহমেদ পর পর বেশ কিছু ভাল নাটক উপহার দেন। তিনি অচিরেই কথা সাহিত্যিক হিসেবে প্রসংশিত ও দর্শকের প্রানঢালা ভালবাসার অধিকারী হন। তাঁর গল্প, উপন্যাস এবং নাটকের বিশেষত্ব হল, ঘটনার স্বাভাবিকতা, স্বতস্ফূর্তভাবে সংলাপ বেড়িয়ে আসা এবং প্রতিটি চরিত্রের মোটামুটি সমান উপস্থিতি। হুমায়ূন আহমেদ যেন গল্পটি শুরু করে দেন মাত্র। ঘটনা তারপর নিজস্ব ধারায় চলে। সংলাপ গুলো তিনি লিখেন না। পাত্র-পাতরীদের মুখ থেকে আপনা-আপনিই বেড়িয়ে আসে যেন। বাড়ীর চাকর-বাকরেরা শুধু কাঁধ থেকে গামছা টেনে টেবিল-চেয়ার পরিষ্কার করে না; তাদের সংলাপ শুধুমাত্র দিদিমনি আর দাদাবাবুতে সীমাবদ্ধ থাকে না।

নাটকে দরকারী চরিত্র হিসেবে তারা সশরীরে উপস্থিত থাকে আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত। এ প্রসংগে মরহুমা মাহমুদা খাতুনের দক্ষ অভিনয়ের কথা মনে পড়ে।

হুমায়ূন আহমদের জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটকগুলোর মধ্যে ‘এই সব দিনরাত্রি’, ‘বহুব্রীহি’, ‘আজ রবিবার’, ‘নক্ষত্রের রাত’, ‘কোথাও কেউ নেই’ এবং ‘অয়োময়’ উল্লেখযোগ্য। অয়োময় ধারাবাহিকটি একটি ঐতিহাসিক পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবন ও জমিদারীর প্রতি বিতৃষ্ণ মধ্য বয়সী জমিদারকে ঘিরে নাটকের কাহিনী। প্রতিটি প্রায় এক ঘন্টা দীর্ঘ বাইশ পর্বের এই ধারাবাহিকটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বার দেখার গর্ব নিয়ে থাকি, খোদ হুমায়ুন আহমেদ বা আসাদুজ্জামান নূরকে একদিন চমকে দেব। একই নাটক এতবার কেউ দেখে?

আমেরিকা দেখতে হলে বিমানে ভ্রমন নয়, গাড়ী নিয়ে পথে নামা দরকার। টরন্টো ও মন্ট্রিয়ল সহকারে দীর্ঘ ৫০০০ মাইলের পথে বেরিয়ে পরি। পথিমধ্যে ইন্ডিয়ানাপোলিসে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ আরশাদ শেখের বাড়ী। টেলিফোনে স্যার বললেন, ‘নৃপেন, আমার বাড়ীতে অন্তত একটি রাত থাকতে হবে। বিশ বছরে আমি কতটা বুড়ো হলাম, তুমি দেখে যাবে না? আমি দেখব না তুমি কত বুড়ো হলে?’ এর পর আর কোন কথা থাকতে পারে না। অগত্যা, ১৬ মে ২০০৮ স্যারের অতিথি হয়ে গেলাম।

স্যারও নাটক দেখতে ভাল বাসেন জেনে উদ্বেলিত হয়ে পড়লাম। ডঃ হুমায়ূন আহমেদের ‘অয়োময়’ নাটকের উৎকর্ষতা নিয়ে আমার পাগলামি চাপিয়ে রাখতে পারলাম না। কম করে হলেও চল্লিশবার দেখেছি। অপেক্ষা করি, স্যার বলুক, ‘তুমি তো রেকর্ড করে ফেলেছ হে!’ কিন্তু স্যার আমাকে একবারে হতাশ করে দিলেন। রন্ধনশালায় টেলিভিশন সহ ক্যাসেট প্লেয়ারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ‘বেরিয়ে আসা ক্যাসেটটির লেবেলটি পড়তে পার কিনা দেখতো!” ‘অয়োময়’। ভাবী বললেন, ‘ওটা ওখানেই থাকে। বাচ্চাদের কার্টুন দেখার মত বিরামহীন ঐটাই দেখে।’ আমার অহংকার নিমেষে চুরমার হয়ে গেল।

প্রায় দেড়শ বছর আগের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদারীকে ঘিরে এক বিশাল পটভূমির উপর ‘অয়োময়’ নাটক। কিন্তু মাত্র বাইশ পর্বে শেষ করা হয়েছে। প্রধান চরিত্র – চল্লিশ বছর বয়সের জীবন ও জমিদারীর প্রতি বিতৃষ্ণ মধ্য বয়সী এক জমিদার। জমিদারী নাম ছোট মির্জা। ঘরে ছোটসাব। আম্মা ডাকেন – ছোটবাবু। প্রয়োজনীয় কথাটিও বলবেন না। চোখে মুখে প্রায়শঃই বিরক্তির ছাপ। বেশীর ভাগ সংলাপই, “এখন যাও।” সবাই তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা দুটোই করে অথচ ধারে কাছে কেউ আসতে চায় না।

জমিদারের দুই স্ত্রী। তাদের সাথেও তেমন কথা হয়না। শুধু প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত কথা হয়। কিছু রক্ষিতা জাতীয় মেয়ে মানুষ এবং মদ্যপানের প্রতি আসক্তি ঢুকিয়ে অনেক রসালো কাহিনী এবং সংলাপ বানাতে পারতেন। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ তা করেননি। স্ত্রীদের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করে অনেক সস্তা কাহিনীও তৈরী করতে পারতেন। তিনি তাও করেননি। অত্যন্ত একাকী এবং সাদামাটা চরিত্র। এহেন একটি মূখ্য চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে ধরে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। এই অসম্ভবকে সম্ভব করা হুমায়ূন আহমেদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। সত্যিকার অর্থে তিনি একজন সফল কথা সাহিত্যিক। ‘অয়োময়’ তাঁর এই অসাধারান ক্ষমতার স্বাক্ষর। মিলিয়ে ঝিলিয়ে একটা গালগল্প তিনি বানান না। তাঁর গল্প বা কাহিনীতে তথাকথিত নাটকীয়তা বা চাঞ্চল্যকর ঘটনা নেই। একটি বিষয়-বস্তু নিয়ে তিনি এক-একটি নাটক শুরু করেন মাত্র। তারপর গল্পটি আপন ধারায় স্বাভাবিক গতিতে চলে। সংলাপগুলো যেন হুমায়ূন আহমেদ লিখেন না। পরিবেশে চরিত্রগুলো প্রভাবিত হয়। তখন সংলাপ মুখ থেকে আপনা থেকেই উৎসারিত হয়ে আসে। নাটকের সাফল্য এখানেই। ফলে নাটকের আকর্ষণ বা উৎকর্ষ গল্পে না হয়ে হয় সংলাপে।

হুমায়ূনী সংলাপ ও ঘটনার সমন্বয়ের কিছু নমূনা

জমিদার খেতে বসেছেন উচু করা একটি বিশেষ জায়গায়। পরিচারিকা ষোড়শ ব্যাঞ্জনে জমিদারকে ঘিরে ফেলেছে। বাম পাশে ছোট স্ত্রী এলাচি বেগম জমিদারকে অনিচ্ছাকৃত সাহচার্য্য দিচ্ছেন। ডান পাশ বড়বৌ। বড়বৌয়ের কোন নাম নেই। তিনি যত্ন সহকারে সহাস্য বদনে স্বামীর পাতে একে একে ব্যাঞ্জন তুলে দিচ্ছেন। জমিদারের মেজাজ অসাধারন ভাল। একটা গল্প বলার সখ হল।

> ছোটসাব - বুঝলা, আমার দাদাজান যখন খাইতে বসতেন, তখন তাঁর পাঁচ স্ত্রী তাঁকে ঘিরা্যা বসত।
>
> এলাচি বেগম – আপনিও পাঁচটা বিবাহ করেন। কোন অসুবিধা তো নাই। (বড় বৌ বিপদ বুঝতে পেরে জিভে কামড় দিয়ে ফেলেছেন)
>
> ছোটসাব – আমি একটা গল্প বলছিলাম। আর তুমি তার মধ্যে কথা বললা! তুমি যাও এখান থেকে। (এলাচির প্রস্থান)
>
> ছোটসাব – আচ্ছা বড় বৌ, আমি কি মানুষটা খারাপ?
>
> বড়বৌ – না। আপনি খুব ভাল মানুষ।
>
> ছোটসাব – তুমি সব সময় মন-পাওয়া কথা বল। আমি মন-পাওয়া কথা একদম পছন্দ করি না। এই কথাই যদি আমি ছোট বৌকে বলতাম সে কখনোই মন-পাওয়া কথা বলত না।

এলাচি বেগম কাছেই ছিলেন। এক ডাকেই প্রবেশ করলেন।

> ছোটসাব – ছোট বৌ, আমি মানুষটা কেমন?
>
> এলাচি বেগম – আপনি মানুষটা ভালও না, আবার খারাপও না। আপনি পাগল কিসিমের মানুষ।
>
> ছোটসাব – তুমি আমাকে পাগল বললা। যাও এখান থেকে।

এলাচি বেগমের আবার প্রস্থান। জমিদারের আর খাওয়া হলনা। মনের ভিতর আকুলি-বিকুলি চলতে থাকল, আমি কি পাগল?

ছোট ছোট ঘটনা ও যথার্থ সংলাপ হুমায়ূন আহমেদের নাটকের বৈশিষ্ট। আর এজন্যই তিনি কথা সাহিত্যেক। তাঁর এই অসামান্য দক্ষতার জন্যই তাঁর নাটক এত ভাল লাগে।

জমিদারী দেখাশুনার প্রতিও তেমন দায়িত্ববোধ নেই। নিলামে একদিন জমিদারী চলে গেল এক প্রজার হাতে। কষ্টে অন্ধ মায়ের বুক ঝাজড়া হয়ে যাচ্ছে। বড় বৌ শ্বাশুড়ীর সেবা যত্ন করছেন। এই বিভ স্য সময়ে ছোট সাব কেমন আছেন, দেখতে এসেছেন ছোট বৌ এলাচি বেগম। ছোটসাব তখন সাজগোজ করছেন। চোখে যত্নে সুরমা লাগাচ্ছেন। হাতে দামী আতর। স্ত্রীকে বলছেন, 'আতরটি মৃগনাভি থেকে তৈরী, হাজার টাকা তুলা।' এলাচি বেগম বলছেন, 'আপনার জমিদারী চলে গেল, আর আপনি গায়ে আতর লাগাচ্ছেন!' জমিদারের উত্তর, 'কত রাজা-বাদশার রাজত্ব চলে যাচ্ছে, আর এতো তিন পয়সার জমিদারী!' এলাচি বেগমের মাথায় দ্রুত রক্ত উঠে গেল। ছোট সাবের হাত থেকে আতরের শিশিটি ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে সজোড়ে আঘাত করেন। শিশিটি ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

দর্শক ভাবছে ছোটসাব এলাচি বেগমকে প্রচন্ড মারবেন। ছোট সাব নিম্ন গলায় বলবেন, 'কাছে আস, আরও কাছে, আরও কাছে।' এলাচি বেগম ভয়ে ভয়ে এক কদম দু-কদম করে কাছে আসবেন। ছোট সাব তখন এলাচি বেগমের গালে সজোড়ে চড় মারবেন। এলাচি বেগম টাল সামলাতে গিয়ে মাটিতে পড়ে যাবেন। ছোট সাব ডাকবেন, 'কে আছ, একে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

ছোটসাব হুমায়ূন আহমেদের হাতে তৈরী একটি চরিত্র। দর্শকের কি সাধ্য যে আগে থেকে যা ভাববে তাই হবে? ছোট সাব শান্ত নরম গলায় বললেন, 'এলাচি, দরজা-জানালা গুলো বন্ধ করে দাও। সুগন্ধটা ঘরে আটকা পড়ে থাকুক।' চোখের সামনে জমিদারী চলে গেল। বৃদ্ধা মা সহ প্রতিটি প্রানীর কষ্ট হচ্ছে। এলাচি কষ্ট ধারন করতে পারেনি বলেই হাজার টাকা দামের আতরের শিশিটি ভেংগে ফেলেছেন তা তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। জমিদারী ধরে রাখার দায়িত্ব ছিল তাঁর। তিনি তাঁর নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। এজন্য তাঁর কষ্ট কোন অংশে কম নয়।

কয়েকদিন পর। নতুন জমিদার ঢাক ঢোল পিটিয়ে জমিদারী দখলের উৎসব করছেন। অন্ধ মা আর সহ্য করতে পারছেন না। বিলাপ করছেন। হঠাৎ ছোটবাবুর কথা মনে পড়েছে। এলাচি বেগম দৌড়ে এসেছেন দেখতে। ছোট বাবু তখন শ্যালিকার সাথে পুতুল নাচ খেলছেন। পুতুলটি দাদাজান মেলা থেকে তাঁর জন্য এনেছিলেন। তিনি পরম উৎসাহে শ্যালিকাকে সেই গল্প শুনাচ্ছেন। কেউ দেখছে না তাঁর হৃদয় তুষের আগুনের মত কেমন করে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে।

নাটকের সমাপ্তি

দীর্ঘ প্রত্যাশার অবসান ঘটিয়ে ছোট স্ত্রীর গর্ভে একদিন এক কন্যা সন্তানের জন্ম হল। সংসারে তখন সীমাহীন আনন্দ। ষোলকলা পূর্ণ করতে জমিদারী ফিরে পাওয়া দরকার। বড়বৌ ববাবরই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। অন্যের অপরাধ নিজের কাঁধে নিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুজেছেন সারাজীবন। সেই বড় বৌ ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারন করলেন। নতুন বংশধরের জন্য হৃত জমিদারী ফিরে পাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এই ষড়যন্ত্রে নতুন জমিদারের খুন হলেন। তাঁর স্ত্রীর গর্ভপাত হল। তিন পয়সার জমিদারীর জন্য এত কিছু! ছোট মির্জা সহ্য করতে পারলেন না। মুখ থেকে কথা বেরোল না। গায়ে তখন তাঁর নীল পাঞ্জাবী, পড়নে পাজামা, পায়ে চটি। তিনি মহাপ্রস্থানে বেড়িয়ে পড়লেন। পথে নদী। নৌকায় পালে হাওয়া লেগেছে। আকাশে ছিন্ন ভিন্ন মেঘ। দু-চারটে পাখী মনের আনন্দে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। ছোটসাব উদ্ভ্রান্তের মত তাকিয়ে দেখছেন। একসময় বললেন, "মাঝি, আপনি গান জানেন?" মাঝি মাথা নেড়ে জানাল, গান জানেনা। নৌকা দিগন্তে মিলিয়ে গেল। এভাবেই ধারাবাহিক নাটকটির পরিসমাপ্তি।

আমার কাছে এই নাটকটি বিশ্বের সেরা নাটক মনে হয়েছে। কত আক্ষেপ হয়েছে ছায়াছবির মত নাটকের আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন নেই বলে। নাটকটির যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন বলে আরশাদ স্যারকে আমার দারুন ভাল লাগছে।

এখন নাটকের বান এসেছে

বাংলাদেশে নাটকের এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। হুমায়ুন আহমেদের উত্তরসূরীরা ধারাবাহিক নাটকে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বাংলাদেশের মাটিতে বিশ্বের ভাল নাটকের মহাসমাবেশ ঘটছে। অনেক নতুন নাট্যকার তৈরী হয়েছে, সাথে সৃষ্টি হয়েছে অবিশ্বাস্য রকমের অভিনেতা-অভিনেত্রী। ধারাবাহিক নাটকে এঁরা নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। হুমায়ুন আহমেদের নাটক না দেখে অন্য নাটক দেখব এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। ইদানীং পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বা সালাউদ্দীন লাভলু বা নাট্যকার আনিসুল হক বা বৃন্দাবন দাস বা শাখাওয়াত আল মামুন নাম দেখে নাটক নির্বাচন করি। কখনও আবার দেখি নতুন জনপ্রিয় অভিনেতা ফজলুর রহমান বাবু, মোশারফ করিম, সোহেল খান, তিশা বা তিন্নি আছে কিনা।

আজকাল অনেক নাটকের পটভূমিই অঞ্চল বা জেলা ভিত্তিক। নাটকগুলোতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহাবের ফলে নাটক যেন নিজের মুখে কথা বলছে। নাটকের চিত্রায়ন হচ্ছে গ্রামে গঞ্জে, পথে ঘাটে, খানা-খন্দে, অলিতে-গলিতে, চিপা-চাপায়; কোন বাহুল্য নেই, নেই কোন রহস্যময়তা, আগাগোড়া পরিচ্ছন্ন নাটক। কলা-কুশলীরাও যেন ওখান থেকেই

বেরিয়ে এসেছে। এগুলোকে আর অভিনয় মনে হয়না। সত্য ঘটনাকে চলচ্চিত্রায়িত করা হয়েছে যেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে আসাদুজ্জামান নূর, আফছানা মিমি, লাকী ইনাম বা সুবর্না মোস্তফা চোখের সামনে ভেসে উঠত। নতুনদের অনবদ্য অভিনয়ের আলোকে পুরাতনরা ফিকে হয়ে গেছে রাতারাতি। এখন প্রতিটি নতুন মুখ অত্যন্ত ভাল অভিনয় করে। চার-পাঁচ বছরের বাচ্চারা যে কী ভাল অভিনয় করে বলে শেষ করা যাবে না। অনেক বয়স্ক অভিনেতাও এসেছেন। ভাল অভিনয় করেন। কোথায় ছিলেন এরা এতদিন?

লক্ষ্য করলে আরও একটা জিনিষ মনে হয়। আজকাল যেন আর নাটকের পূর্বনির্দ্ধারিত কোন সংলাপ থাকে না। প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে দৃশ্যপট বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কলাকূশলীরা তখন নিজকে ভুলে চরিত্রের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। দৃশ্য শুরু হয়, শুটিং চলে। দৃশ্য অনুপাতে সংলাপ বেরিয়ে আসে। নাট্যকার এবং পরিচালকের পছন্দ না হলে বা নতুন সংযোজনের দরকার মনে হলে, দৃশ্যটির আবার শুটিং করা হয়। প্রতিটি দৃশ্য হয় ছোট – বড়জোর পাঁচ মিনিট। তারপর চলে সংযোজন-বিযোজন।

কয়েকটি অসাধারন ধারাবাহিক নাটকের নমূনা

সালাউদ্দিন লাভলুর পরিচালনায় মাসুম রেজার ভবের হাট

হাল্কা বিনোদনমূলক নাটক। পাত্র-পাত্রীদের নাম গুলোও বেশ বাহারী, মজাদার। আয়না, গয়না, খুসবু, নকসী, রুমালী, আংগুরী, ধবলা, আধুলী, নাটা, তোফা, ফিজা। অস্থির ও মেরুদন্ডহীন ফিজা মাষ্টার শুধু মেয়েদেরকেই প্রাইভেট পড়ায়। অপ্রয়োজনে সার্বক্ষনিক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে। মাঝে মধ্যেই ভুল ইংরেজী শব্দ ভুল জায়গায় অপপ্রয়োগের কারনে তার সংলাপগুলো খুবই উপভোগ্য হয়েছে। তার এই মুদ্রাদোষ এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে যে, বাংলায় কিছু বলার পরে সেটিকে ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করে বুঝিয়ে দেয়। নিজের অশিক্ষিত মায়ের সাথেও একই কাজ করে।

কথায় কথায় এই রকম উপভোগ্য ইংরেজী শব্দ অনর্গল ব্যবহার চাট্টিখানি কথা নয়। সবগুলো সংলাপ নাট্যকারের পক্ষে লিখে দেওয়া সম্ভব কি? সংলাপ গুলো বলতে হবে একটা নির্দিষ্ট গতিতে, লয়ে। লয়ে ব্যাঘাত হলে সমস্ত মজাই নষ্ট হয়ে যাবে। নিশ্চয় ফিজা মাস্টারকে যথেষ্ঠ অনুশীলন করতে হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধরনের সংলাপ চালিয়ে যেতে। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ফলে নাটকটি আরও বেশী প্রানবন্ত ও মজাদার হয়েছে।

সালাউদ্দিন লাভলুর পরিচালনায় বৃন্দাবন দাসের ঘরকুটুম

আঞ্চলিক ভাষায় আর একটি অসাধারন নাটক। ফজলুর রহমান বাবু ও তার মুখপোড়া স্ত্রীর অনন্য অভিনয় এক বিরাট আকর্ষন এই নাটকের। গহর চরিত্রের এই ভদ্রমহিলাকে আমার নমস্কার। এর আগে কখনই তাঁকে দেখেনি। প্রথম নাটকেই তিনি বাজিমাত করেছেন। নাটকের সংলাপ গুলো জুতসই। মোহরজান এবং ভ্যাটার মা আপন মনে গৃহস্থালী করে যাচ্ছেন। কোন দিকে চোখ ফেরানোর ফুসরত নেই। স্বল্প উপস্থিতি হলেও এঁদের অভিনয় অনবদ্য। সবাই ভাল অভিনয় করেছেন। কাকে রেখে কাকে বেশী ভাল বলব তার জো নেই। নাটকটি এখনও চলছে।

আকরাম খানের পরিচালনায় মশিউল আলমের নাবিলা চরিত

পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সচিবের কঠিন আদর্শে গড়া মেয়ে নাবিলা। বিশ্ববিদ্যালয়ে চরিত্র গঠন ও জ্ঞান অর্জনই মূখ্য তপস্যা ছিল। নিজে কোন ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখেন নি। কোন ছেলেও তার চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস রাখেনি। তিনি এখন বাবার মত পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়েই চাকুরী করেন। একটি দেশের পররাষ্ট্র নীতির সফলতা নাবিলার হাতে। কথা-বার্তা, চাল-চলন, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বাবার আদর্শ কথা বলে। আভিজাত্যের ছাপ চলনে-বলনে। কিন্তু অতি নিরহংকার এবং বিনয়ী। সব কিছুই মাপকাঠিতে চলে। এই কঠিন চরিত্রটিতে সফল রূপ

দিয়েছেন রিচি সুলায়মান। বিয়ে টিকেনি। বিয়ে নামক গৌন ব্যাপারটি নিয়ে ভাবার সময় নেই আর। বাড়ীতে এক টোকাইকে ঠাই দিয়েছেন। ছেলেটিকে পরম আত্মীয়ের মত দেখে। নিষ্ঠার সাথে পড়ালেখার খোঁজ রাখেন, ছেলেটির যেকোন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেন। সব কিছু মিলিয়ে শুধু এক আদর্শ নারী নন, এক মহামানবী। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্ভ্রান্ত সন্তান।

সাংবাদিক রফিকেরও বিয়ে ভেংগে গেছে। হঠাৎই একদিন দেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন আর একজনকে দেখেছে বলে মনে পড়ে। অনেক কথাও মনে পড়ে। তারপর নিয়মিত দেখা হয়। এই দেখা একদিন বিয়ে পর্যায়ে চলে যাবে কেউ ভাবেনি। দ্বিধাদ্বন্দ ভেংগে একদিন বিয়ে হয়। রফিকের বাহির-মুখো স্বভাব নাবিলার জন্য অস্বস্তিরতার কারন হয়। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার জোড়ে নতুন সংসারকে ধরে রাখতে সক্ষম হন। বিলম্বিত লয়ে চলতে থাকা এই নাটক বায়ান্ন পর্বে শেষ হয়েছে। মশিউল আলমের নাটক আগে দেখিনি। কিন্তু তিনি যে একজন নিপুন এবং ব্যতিক্রমধর্মী শক্ত নাট্যকার নাবিলা চরিত তার স্বাক্ষর। এই নাটকটি উপভোগ করতে হলে সমস্ত কাজ ফেলে কথাবার্তা বন্ধ রেখে নিবিষ্ট মনে দেখতে হবে। পাত্র-পাত্রীদের চোখ-মুখের ভাঁজ এবং নড়ন-চড়ন দেখে মন বুঝতে হবে। একবার শুরু করলে বায়ান্ন পর্ব দুদিনেই শেষ হয়ে যাবে। শেষ হওয়ার পরে মন খারাপ লাগবে, আরও কিছুদিন কেন চলল না! রিচি সুলায়মান নাবিলা চরিত্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রূপায়ন করেছেন। তাঁকে নাবিলা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। অন্য চরিত্রে তাঁকে দেখলে দর্শকরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। দারুন কষ্ট হবে।

মোস্তফা সারোয়ার ফারুকীর পরিচালনায় আনিসুল হকের ৬৯

অত্যন্ত উপভোগ্য নাটক। মূলতঃ এক বাবার দুই ছেলে এবং চার মেয়েকে ঘিরে এই ধারাবাহিক। ছেলেমেয়েদের প্রেম-বিবাহ-বিচ্ছেদ আপন ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু যে জিনিষটি অত্যন্ত সুন্দর তা হল ভাই-বোনদের একে অন্যের পেছনে লেগে থাকার মধ্য দিয়ে নিবিড় বন্ধন। সুখের দিন কি দূঃখের দিন, কারও পান থেকে চুন খসেছে কি রক্ষা নেই। যেই সুযোগ পাবে অমনি পিঁয়াজো বানিয়ে ছাড়বে। ভারী মজাদার ভাই-বোনদের দুষ্টুমী খেলা গুলো। মনে হয়, এরা সত্যি সত্যিই একই পরিবার থেকে দুষ্টুমী করতে করতেই বড় হয়েছে। বোনের ভূমিকায় জয়া, তিন্নি, নিশা ও শ্রেষ্ঠা এবং বড়দার ভূমিকায় হাসান মাসুদ সহ এলিয়েন সোহাগ, ফজলুর রহমান বাবু সবাই দারুন অভিনয় এবং যুৎসই সংলাপ ব্যবহার করেছে এই নাটকে।

কল্প ও কথা নাটকী নামে দুজন শিশু শিল্পী আছে। এরা কি আসলেই অভিনয় করে! নাকি এদের বেড়ে উঠার পারিবারিক ভিডিও বড়দের অভিনয়ের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে? বাচ্চাদের জন্য এত সুন্দর অভিনয় ও সংলাপ ব্যবহার অবিশ্বাস্য। আমার তো মনে হয় ঘটনার স্রোতে ওরা ওদের মত চলছে আর অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। বড়রা ওদের সাথে তাল রেখে সংলাপ বলে যাচ্ছে।

মোস্তফা সরোয়ার ফারুকীর ৪২০

এটি একটি দুঃসাহসিক এবং অভিনব নাটক। মোশারফ করিম এবং নিশার অভিনয় অসাধারন। লুৎফর রহমান জর্জ এবং সোহেল খান সহ সবাই নাটকটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। এই নাটকটি দেখার পর, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের নতুন করে চিনতে শুরু করেছি। এদের জন্য কষ্টও হচ্ছে। এরা যেন ধারালো ছুড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে। রাজনীতির সিঁড়িতে এই আছে, এই নেই। কখন যে কাকে লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে, ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে বুঝার উপায় নেই। মনে পড়ছে, প্রায় পনের বছর পর বড়সড় এক নেতা বন্ধুর বাড়ীতে গল্প করছি। স্ত্রী একটি ফোনকল নিয়েই রেখে দিলেন। কলটি আবার এল। এবারে বন্ধুটি ধরল। বিনয়ের সাথে কথা শেষ করেই স্ত্রীকে ঝাড়ি মারতে শুরু করল, ‘অমুকে ফোন করেছিল, বুঝছ! তুমি তো আমার চাকরীটা প্রায়ই খেয়ে ফেলেছিলে!’

নাটকটি চলেছে সুপার সনিক গতিতে। এই ধারাবাহিকের পরের পর্বের জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা খুবই কষ্টকর। মাত্র ৩৫ পর্বে শেষ হয়েছে। প্রতিটি পর্ব পূনর্বিন্যাস করে চার-পাঁচটি পর্ব করলেও এই নাটকের মান কোন অংশেই হানি হত না।

শাখাওয়াত আল মামুনের রচনা ও পরিচালনায় আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা

কিছু চেনা অভিনেতা-অভিনেত্রী না থাকলে ধরেই নিতাম এটা নাটক নয়, কোন ডকুমেন্টারী ছবি। রাত-বিরাতে, আলো-আধাঁরে, অলিতে-গলিতে এই নাটকটি ধারন করা হয়েছে অনেক নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে। এই নাটকটিকে একটি অখাদ্য নাটক হিসেবেও অনেকে চিহ্নিত করতে পারেন। কিন্তু ছিন্ন-ভিন্ন মামুলি ঘটনা সমন্বয়ে এটি একটি অসাধারন নাটক। এর মধ্যে আছে খন্ড-বিখন্ড প্রেম, ভালবাসা, অভিমান, ছাড়াছাড়ি, আবার ফিরে আসা। অগুনতি অভিনেতা-অভিনেত্রী। ছোট ছোট অজস্র দৃশ্যের ছড়াছড়ি। কলা-কুশলীদের সবাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নানাবিধ স্বপ্ন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অভিনয়, কবিতা-সাহিত্য, সিনেমা পরিচালনা, বিজ্ঞাপন মডেল, গায়ক, চিত্রশিল্পী। স্বপ্ন সব সময় পূর্ণ হয় না। লেনদেনের ধরন অস্বাভাবিক দেখে এক চরিত্রকে রাতের বিনোদিনী মনে হল। কেউ আবার জীবন সায়াহ্নে এসে জীবন সঙ্গিনী খুঁজে চলছে। অনেকেই ঠিকানাহীন। পার্ক বা চায়ের দোকানের বেঞ্চ, যেখানে রাত সেখানেই কাত। ঠিকানা একটাই - আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। এরকম একটি জটিল নাটক রচনা এবং পরিচালনা করা যে কঠিন তা আল মামুন জানেন আর বুঝতে পারবে যারা কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখে।

তিন্নির অভিনয়ের প্রশংসা না করে উপায় নেই। একটি দৃশ্য এরকম। ভালবেসে বিয়ে। নিজ নিজ পেশা গঠনের তাগিদে ভুল বুঝাবুঝি এবং বিচ্ছেদ। বন্ধুদের উপদেশে বিচ্ছেদ সবে শেষ হয়েছে। তাই বিবাহ বার্ষিকীটা একটু ধূমধামেই শেষ হল। বন্ধুরা বিদায় হয়েছে। দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ স্বামীর সাথে এক মেয়ের ঢলাঢলির ছবি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। তখন তিন্নির যে ফুলঝুড়ির মত সংলাপ, তা কোন নাট্যকারের পক্ষেই লিখে দেওয়া সম্ভব নয়। ঘটনার আবেশে নিজের মধ্যে আবেগ সৃষ্ট না হলে ঐ রকম সংলাপ কিছুতেই বেরোবে না।

আজকাল অভিনেতা হওয়া কঠিন হয়ে গেছে। চরিত্রের সাথে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে হবে এবং অভিনেতাকে ভাল নাট্যকার হতে হবে। নাট্যকার তার লেখার ঘরে বসে সময় নিয়ে সংলাপ লিখতে পারেন। অভিনেতার হাতে সে সময় নেই। তাকে সংলাপ সৃষ্টি করতে হবে দৃশ্যের প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক ভাবে হৃদয় থেকে। হুমায়ুন যুগে কিছু অভিনেত্রীকে তুলনাহীনা ভাবতাম। এখন হাসি পায়। তিন্নির এই দৃশ্য দেখে মনে হয় - কোথায় আগরতলা আর কোথায় খাটের তলা! কোথায় কায়েদে আজম আর কোথায় বদ-হজম!

১৮ই জুলাই ২০০৮, টেক্সাস।

লেখক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ বছরের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারীতে আমেরিকা চলে আসেন। বর্তমানে তিনি টেক্সাসের প্রেইরী ভিউ এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রকৌশলের শিক্ষক, গবেষক এবং প্রোগ্রাম নিরীক্ষা সমন্বয়ক।